ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No.1055-1062
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.322

‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’- ফাঁপা মানুষের উৎসসন্ধান

ড. সুদেষ্ণা মৈত্র, *স্বাধীন গবেষক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

‘Winkle Twinkle’ (2002) of Bratya Basu is a political play highlighting the contemporary political ideals and differences. This dissertation aims at the crisis born of dreams and disillusionment of two main protagonists of the play. It also tries to find out the contemporaneity of the play after almost a quarter of a century. With his selfless values Sabyasachi dreams of an ideal society, Indra despite being the son of an ideal father joins the opposite political camp. This paper delves deep into the psyche of present generation to find how do they perceive such defection. ‘Winkle Twinkle’ is used to search the reason why living in a political backdrop today’s youth turns his face from politics. Hollow substanceless present generation owes its origin to the repeated shattering of dreams and this paper aims to highlight it.

Keywords: Political Disillusionment, Youth and Politics, Ideological Conflict, Contemporary Bengali Theatre, Dream and Crisis

“আমরা যেদিন আগুনের নদী থেকে
তুলে আনলাম মা’র ভেসে যাওয়া দেহ
সারা গা জ্বলছে বোন তোর মনে আছে
প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ।”[১]

২৬ বছর পর নিজের বাড়ি ফিরে এসে সব্যসাচীও কি সেই মা’র ভেসে যাওয়া দেহের মুখোমুখি হয়নি? মুখোমুখি হয়নি হাজারও প্রশ্ন ও সন্দেহের? সময়ের চেয়ে এগিয়ে বাঁচা মানুষকে ঘিরে আমাদের উন্মাদনা, বিস্ময় এবং প্রশংসাধ্বনি বেজে ওঠে অনায়াসে। কিন্তু যে মানুষটি সময়ের চেয়ে ২৬ বছর পিছিয়ে পড়েছে, যে মানুষটি’র ঘুম ভাঙলো সবেমাত্র আর দেখলো তার চোখের সামনে বদলে গেছে পৃথিবী। সেই বদল শুধু বিশ্বায়নের বহির্ঘাত নয়, আঘাত লেগেছে অন্তরে। যে আঘাতে মনে পড়ে যায় নাটককার তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’ নাটকের রহিমের সেই মর্মভেদী উক্তি- “আল্লা! মোর যন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল।” (তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য)। রহিমের এই দিলের রবাব যেভাবে ছিঁড়ে গেল, এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতে হঠাৎ ঢুকে পড়া ডোডোপাখির মতো অতীত নিয়ে বিভোর, স্বপ্নগ্রস্ত সব্যসাচীও যতবার বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছেন, হৃদয়বীণা ছিঁড়ে যাচ্ছে বীভৎস শব্দ করে। নাটককার এবং নাট্যকার ব্রাত্য বসুর ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ এক দীর্ঘ পরিচিত, প্রচারিত, বিতর্কিত অথচ সফল নাটক। বহু আলোচনা ও সমালোচনার দেবযানে চড়ে নাটকটি পার

হয়েছে প্রায় ২৫ বছর। এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে তবু মনে হয় এই সময়কে ধরার ক্ষেত্রে ২০০২ সালে প্রকাশিত এই নাটকটি আরো একবার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে এই প্রজন্ম এবং তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক এই পালাবদলের ধান্দামুখর স্বভাব-চরিত্রকে বুঝে নিতে হলে নাটকটির দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। আমরা যারা স্বাধীনতা আন্দোলন দেখিনি, খাদ্য আন্দোলনের হাহাকার শুনিনি, চিন-পাকিস্তানের যুদ্ধে চিন্তিত হইনি, নকশাল আন্দোলনে বলি হওয়া ১০৮৪'র আর্তনাদে সামিল হইনি। যারা দেখিনি ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় এসে পাঁচ বছর শাসন করে যাওয়া বাজপেয়ী সরকারকে। যারা চিনতে পারিনি ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে ২০০০ সালে ক্ষমতায় আসা পার্টি আসলে ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতীক। যারা সুযোগ পাইনি বিশ্বায়নের থাবার প্রথম নখর পড়ে ফেলতে। আমরা যারা নেই-রাজ্যের বাসিন্দা। বর্তমান নৈরাজ্যের সূতিকাঘর নিয়ে ভাবার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যাদের নেই। সেই আমরা, যারা অন্যের স্মৃতিকথা ধার করে বেঁচে থাকি। সামনে নেই কোনো আদর্শ-অবয়ব। পিছনে নেই কোনো লড়াইয়ের অদম্য ক্লান্তি। স্মৃতির যক্ষ সেজে আমরা যারা স্মৃতির শববাহক। একবিংশ শতাব্দী'র দ্বিতীয় দশকে হাতের মুঠোয় শূন্য ধরে বসে আছি। হাত খুললেও শূন্য। তাদের জানতে হবে এই স্বপ্নভাঙনের উপকথার জন্ম ঠিক কবে থেকে। সময় কখনো ধীর লয়ে কখনো দ্রুত লয়ে বহমান। তবু সে তার সমকালীনতার ছাপ ছেড়ে রেখে যায় প্রতিটি পাল্টে যাওয়া হাওয়ার সন্ধিক্ষণে। সময়ের এই লয়, ধ্বনি, ছন্দ একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের মত ধরে রাখতে চেয়েছেন নাটককার ব্রাত্য বসু তাঁর এই নাটকে। যেন কোনো অদৃশ্য ক্যামেরাম্যান, যিনি সমসাময়িক রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেঁটে চলেছেন এবং ক্যামেরাবন্দি করছেন প্রতিটি স্খলন ও বিপর্যয়কে। সেইসব ফটোকপির কোলাজ দিয়েই স্পষ্ট রূপ পেয়েছে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। প্রায় ২৫ বছর পরে এসেও ভারি অদ্ভুতভাবে সমসাময়িক হয়ে ওঠে সেই কোলাজ। মিলে যায় ২০০২ সালের এই নাটকের মুখ্য চরিত্রের সময়চ্যুতির সঙ্গে। নাটকে সব্যসাচীর বোধের কাছে তাঁর ঘুমিয়ে থাকা ২৬ বছরের কোনো স্মৃতি নেই। তাই, তাঁর চারপাশের এই পরিবর্তন তিনি ধরতে পারছেন না। আমাদেরও সময়চ্যুতি ঘটেছে অতীতের সঙ্গে। আমরা বহুদিন ধরে জেগে ঘুমিয়ে আছি। এই চ্যুতিময় সময়ের ইতিহাসের দলিল জানা না থাকলে বর্তমানের প্রতিটি দেখা ধোঁয়াশার মতো মনে হয়। এই সময়ে রাজনীতি থেকে আমরা গা বাঁচিয়ে চলতেই ভালোবাসি। শাসকপক্ষ, বিরোধীপক্ষ, কে কোন ইস্যু নিয়ে সরব, তার খবর ধামাচাপা পড়ে যায় অজস্র মিম, সারকাজম এবং মিমিক্রির বাড়বাড়ন্তে। এই জেনারেশন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখায় এবং ধান্দাবাজির রাজনীতির বৃত্তে নিজের আখেরটুকু গুছিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি খুঁজে ফেরে। আমাদের তাই জানতে হবে, এই সুবিধাবাদের সূত্রপাত কি এই সময়েই নাকি এর আঁতুড়ঘর অনেক আগেই রচিত হয়েছে? নিজের দেশ, নিজের রাজ্য, তাকে সুস্থ দেখার ইচ্ছে, সেই স্বপ্ন কেন আর দেখে না বর্তমান ও গত প্রজন্ম? ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্তে কেন কোনো রাজনৈতিক দলই মানুষকে পাশে পাচ্ছে না? এই সমস্ত উত্তর খুঁজতেও প্রয়োজন পড়ে, ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকটি। ১৮১৯ সালে লেখা 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' গল্পে রিপ ভ্যানের ঘুম ভেঙেছিল প্রায় কুড়ি বছর পরে। চোখ খুলে দেখে এক বিশাল বদল ঘটেছে তার চারপাশে। পৃথিবী তাকে ছেড়ে হেঁটে এসেছে অনেকটা পথ। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন দেখতে পায়নি ভ্যান। ১৯৭৬ সালে পুলিশের এনকাউন্টার থেকে বাঁচতে ছুটে চলা সব্যসাচী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। সাতের দশকের ঠিক যে সময়ে তিনি অদৃশ্য সেই সময়টি গেল থমকে। সব্যসাচী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বামপন্থী আদর্শবাদ নিয়ে। শ্রমিকের জন্য লড়াই, জনগণের জন্য স্বার্থত্যাগ, ন্যূনতম অধিকারের দাবি, সেইসব মোহময় বৃত্তে। এই থেমে যাওয়ার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিল খুঁজে পাই আমার মায়ের নস্টালজিয়ার- "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম", দীর্ঘদিন গণসঙ্গীতে গলা মেলানো মায়ের বামপন্থার আদর্শগত মোহভ্রান্তি সময়ের থেকে প্রায় ৩০ বছর পিছিয়ে রেখেছে তাঁকে। মায়ের আবেগ-

উচ্ছ্বাসে, মিছিল পথে এখনো হাঁটার শব্দ উঠে আসে থমকে যাওয়া ঘড়ির নির্দিষ্ট মুহূর্তের হাত ধরে। আমরা জানি, এরকম অসংখ্য মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদেরই চারপাশে যারা আজও নস্টালজিয়ায় সব পেয়েছির দেশের স্বপ্নে বাঁচে। কারা এরা? কারা সব্যসাচী, রাজলক্ষ্মী? আরো কত অজস্র চোখ, যাদের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি গেছে নিভে, জ্যোতি গেছে কমে। কিন্তু, একপাশ ফিরে আছে অতীতের স্বপ্নগুলোর দিকে আর বর্তমানকে করছে অস্বীকার। নাটকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র সব্যসাচীর ছেলে ইন্দ্র যেন তাদেরকেই বলছে 'মৃত মানুষ মৃত সময় মৃত বিশ্বাস'। তারা যদি নিজের সময় পেরিয়ে অন্য সময়ে ফিরে আসে তবে তাদেরকে নিয়ে সেই অন্য সময়ের অস্বস্তি বাড়ে। তাদের সেই স্বপ্নগুলোর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাদের দেখা দিয়ে নয়। তাদের না দেখা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে কীভাবে স্বপ্নগুলোর অপমৃত্যু ঘটেছিল। সেই কবর খুঁড়তে এবং খবর খুঁজতে ফিরে পড়তে হয় 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। ১৯৭৬-এ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সব্যসাচীকে নাটককার ইচ্ছে করেই 'পজ' বোতাম টিপে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি অবিরত দৌড়চ্ছে পার্টির আদর্শকে বুকে নিয়ে। যারা জেল খাটছে। যৌথখামারের স্বপ্ন দেখছে। ক্ষমতাতন্ত্রকে, পুঁজিবাদকে ঘৃণা করছে। শ্রমিক-মজুর-কৃষক-সর্বহারার পাশে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিনিধিত্ব করছে আর প্রতিমুহূর্তে রাষ্ট্রের চোখে ধুলো দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে ছুটছে ছুটছে। তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইলেন নাটককার। গুলির দাপটে মেরে ফেললেন না। পরিবর্তনের এই নৈরাজ্যের ঝাপটা দিয়ে আড়াই দশক অতিক্রম করে ধাক্কা দিতে চাইলেন সেই ছুটন্ত ছেলেটিকে। আজ যা ধ্রুবসত্য তা আগামীকাল বাস্তবিকই কতখানি ঠুনকো। আদর্শবাদ কীভাবে ভাঙতে ভাঙতে হয়ে উঠছে সুবিধাবাদ, ভোগবাদ এবং স্বার্থান্বেষী মনোভাবের দাবার চাল। সেইসব নৈতিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের দ্বিচারিতার মুখোশ টেনে খুলে ফেলতে চাইলেন লেখক। কাদের সামনে? অন্তত তাদের সামনে, যারা নির্ভেজালভাবে, নিঃস্বার্থভাবে দলকে সময় দিয়েছে। নবযুগ আনার স্বপ্নে বিভোর থেকেছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছে পার্টির প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রতি। সেই সব্যসাচী ২৬ বছর পর নিজের বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তারই সন্তান বিরোধী পার্টিতে যোগ দিয়েছে। কেন? উত্তরে তাঁর চোখের সামনে থেকে একের পর এক মিথ্যে স্বপ্নে রাঙানো পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে তারই ছেলে ইন্দ্র-

"সব্যসাচী- না না। এখন জরুরি অবস্থা-

ইন্দ্র- না। এখন শীতল অবস্থা।

...

ইন্দ্র- আপনার সময়ের উল কাঁটাটা সোয়েটার বুনে পালটে দিয়েছে সব। ...আচ্ছা, বলুন তো এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে?

সব্যসাচী- সিদ্ধার্থশংকর রায়

ইন্দ্র- না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য"[২]

এবং আইডিয়ালিস্ট বাবা'কে চিনিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্র এই সময়ের দাবি'কে-

"সব্যসাচী- সময় কার, সময় কী সেটা কে ঠিক করবে?

ইন্দ্র- আমি ঠিক করবো। আমরা। আমাদের সময় যদি ফাঁপা হয়, আমরা যদি হলো হই, তা হলে সেই হলোনেসই ঠিক করবে সময় কার। শুনে রাখুন সব্যসাচী সেন আমি আমার সময়ে দাঁড়িয়ে ঠিক।— হতে পারে এই সময়ে কোনও মহৎ আদর্শ নেই, বড় মানুষ নেই। আর এই জন্যই আমরা কোনও টুপি খাই না, আদর্শের ট্যাবলেট গিলি না- আমরা আমাদের মতো করে আমাদের সময়ে সৎ।"[৩]

পড়তে পড়তে মনে হতে পারে, লেখক আজ, এই সময়ের কথা বলছেন। মনে হতে পারে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সবচেয়ে বড়ো ক্রাইসিস এবং সত্যদর্শন লেখা হয়ে গেছে ২০০২ সালেই। তখন প্রশ্ন করতে হয়, এই ২০২৬-এ আমরা ঠিক কোন সময়ের বাসিন্দা। মৃত সময় নাকি জ্যান্ত সময়ের?

নাটকে বাবা সব্যসাচী থমকে যাওয়া সময় পেরিয়ে বাড়ি আসছেন। এখন তাঁর বয়স প্রায় ২৯ বছর। বাড়ির ভিতরে অবস্থিত বর্তমান সময়ের প্রতিনিধি ইন্দ্রর বয়সও ২৯ বছর। বাবা ঠিক যে বয়সে তার অতীতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ছেলের বর্তমান বয়স সেই অতীতের আঁচড়, কামড় সামলে বিরোধীপক্ষ তৃণমূল-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। ইন্দ্র বাবা'র সেই স্বপ্নময় গোলকের ভিতর ঢুকে বাবাকে চিনিয়ে দিচ্ছে বিগত ২৬ বছরের বামপন্থার দ্বিচারিতা, বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস। ইন্দ্র শিখে গেছে সুবিধাবাদী রাজনীতি, ইন্দ্রের দলকে বামপন্থীরা, লুম্পেন আদর্শহীন দল বলে ডাকে। বড্ড রাগ ইন্দ্রের চোখে মুখে। কারণ, আদর্শবাদী বাবার ছেলে ইন্দ্ররা চোখের সামনে দেখে ফেলেছে সেই সব গুন্ডাদের, যারা একসময় বামপন্থার বিরোধিতা করত। নকশালপন্থীদের খুন করত। তারাই এখন সিপিএম করছে। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার মন্ত্রণা পেয়ে হাজার চুরাশির দল কখনো মারা গেছে পুলিশের গুলিতে, কখনো গুন্ডার গুলিতে। আর সেইসব ক্যাডারদের আদর্শ গেলানো নেতারা ক্রমেই ভুলেছে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক। মেহনতি মানুষের কান্নায় ভর করে উঠে আসা পার্টি শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের মোড়কে এলটিজমের হাওয়ায় মেতে ভুলে গেছে সর্বহারার অধিকারের দাবি দাওয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি। স্বজনপোষণ আর রুচিশীলতার অক্ষরবাহী পুঁজিবাদী শাসকসমাজ তাই চাকরি দেয় ইউনিয়ন সেক্রেটারির আত্মীয়কে। যদিও পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী সব্যসাচীর ছেলে ইন্দ্র'র রেজাল্ট তার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যেই নাটককার ইন্দ্রকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন এক মোক্ষম সংলাপ- "রাজনীতি করলেই যে কিছু পাওয়া যায় সেটা একটা বাচ্চাও জানে।"[৪]

এই জানার উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ছাত্রসমাজ। যে সংক্রমণের সূত্রপাত বহু যুগ আগে। সেই তরুণসমাজ আজ অনায়াসে পিস্তল চালানো শেখে। ইউনিভার্সিটির গেট ভাঙে। কলেজের ভিতর 'রেপ' হয় এবং হওয়ার পর থ্রেট হয়। এইসব ছন্নছাড়া, লোফার, লুম্পেনের রাজনৈতিক আবহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই অন্তরের হাল হাকিকত। অজস্র না পাওয়া আর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাসে হয়তো একবিংশ শতাব্দী এমন ছাত্রসমাজের জন্ম দিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন জন্ম হয়েছে সব্যসাচী সেনের। তারপর থেকেই স্বাধীনতাকে ঘিরে যে লোফালুফি আর অজস্র দ্বিচারিতা, তারই মাশুল গুণে চলে ইন্দ্রেরা-

ইন্দ্রঃ "ভুলের জন্ম কবে আর ঠিক থেকে হয়েছে। ভুল থেকেই তো ভুলের শুরু।" (পৃ. ২৪৯)

একবিংশ শতাব্দীতে মেধা সম্পন্ন ছাত্রের দল কেন রাজনীতি বেছে নিচ্ছে না? কেন তারা দিন বদলের স্বপ্ন দেখছে না? তার কারণ কি এই যে, তারা চোখের সামনে প্রতিমুহূর্তে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মুখের কথার পরিবর্তন ঘটতে দেখছে? দেখছে প্রতিঘন্টায় নেতাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট যাচ্ছে পাল্টে। এমনকী এই সময় দাঁড়িয়ে উইঙ্কল টুইঙ্কল'এর মত কোন নাটক, উপন্যাস বা গল্পের জন্ম হতে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সামাজিক সমস্যাগুলো ভয়াবহ। রাজনৈতিক অবক্ষয় খাদের কিনারে। ২০২১ সালের তথ্য বলছে প্রতিদিন গড়ে ২৫ জন কৃষক আত্মহত্যা করে। দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার প্রায় ২৯ শতাংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর বার্ষিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, প্রতিদিন গড়ে ৮৬টি করে ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়। অথচ, চারপাশ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুখ ফিরিয়ে। ফুল খেলবার দিন পেরিয়েছে কবেই, তবু অন্ধ কোকিলের মত সাহিত্য-ফ্যাশন-সংস্কৃতি-মূর্তি উন্মোচন আর নান্দনিকতার ফাঁপা আবর্তের ভিতর নিজেকে নিজে গিলে চলেছে আমাদের দেশের তরুণ শিক্ষিতসমাজ। একমাত্র নাটকই পারে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, বলগাহীনভাবে,

তীক্ষ্ণভাবে সমসাময়িকতাকে তুলে ধরতে। প্রখ্যাত নাটককার, নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার মিনার্ভা থিয়েটার আয়োজিত এক বক্তৃতায় রাজনীতিসচেতন থিয়েটারের অভাবের দিকে আঙুল তুলে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই সকল নাট্যস্রষ্টাকে, যারা একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অবক্ষয়গুলিকে তুলে ধরে রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করবে, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করবে। ঠিক যেভাবে নাটককার ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। ২০০২ এর সাময়িক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র তার মাকে জানাচ্ছে, কীভাবে বিজেপির মত সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ডানপন্থা, বামপন্থা প্রতিটি রাজনৈতিক দল, তাদের সুবিধা এবং স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য। ধরা পড়ে গেলে দোহাই দিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির। এই হাত মেলানোর সংস্কৃতির ঘনঘন নিঃশ্বাসে আমরা এত বেশি অভ্যস্ত এখন যে, গুলিয়ে ফেলি কে কার আপনজন-

"ইন্দ্র- "হ্যাঁ, আমি তৃণমূল করি। পরিষ্কার শুনে নাও- ওখানে যদি আমার ধান্দা ঠিকঠাক না পোষায় তাহলে কাল দরকার পড়লে ওই বিজেপি করব। রামমন্দির চাইব, করসেবা করব, ময়দানে গিয়ে হাফ প্যান্ট পরে মার্চ করব।"[৫]

বর্তমানে সিপিএম এক শূন্য পাওয়া দল। মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, এলিটিজমের সুবিধাবাদ, মাটির সঙ্গে সংযোগরক্ষায় ব্যর্থতা এই দলকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে। এই দলই একদিন আশার আলো দেখিয়েছিল, মানুষই সব। মেহনতি মানুষের শক্ত হাত এবং প্রান্তিক মানুষের মৌলিক অধিকারের লড়াই, একমাত্র এই পথেই 'সুজলাং সুফলাং' পৃথিবী সকলের কাছে ভোগযোগ্য হয়ে উঠবে। সেই দল তার পদস্খলনের পর আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কেন? এর উত্তর, স্তালিন সব্যসাচীকে জানিয়ে দিয়ে যায়। পার্টিকে তিনি পৌরাণিক চরিত্র আন্টিয়াসের সঙ্গে তুলনা করেন। মাটি যার ভাগ্য নির্ধারক। আন্টিয়াসকে মাটি থেকে উপড়ে ফেললে তার মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনভাবেই, পার্টি যখনই মানুষ বা মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবে, সেই পার্টিরও মৃত্যু নিশ্চিত-

স্তালিন- "যতদিন পার্টি মাটি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবে, ততদিনই তারা অপরাজেয় থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা মাটি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ হারাবে, সেই মুহূর্তে তাদের পতন হয়ে উঠবে আসন্ন তথা অনিবার্য।"[৬]

নাটকে 'রাজেন' চরিত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র, যার সংলাপের ভিতর দিয়ে সব্যসাচী জানতে পারছে পার্টির পুঁজিবাদী মানসিকতা এবং সময়কালীন পরিবর্তনের ইতিহাস। রাজেনকে প্রয়োজন ছিল সব্যসাচীর। কারণ, একইসঙ্গে কাজ করে চলা সমবয়সী এই বন্ধু চাক্ষুষ করেছে চারপাশের রাজনীতির বদলে যাওয়াগুলো। সব্যসাচীর এই অপরিচিত চারপাশের ভিতর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী এবং বন্ধু রাজেন যেন খড়কুটোর মতো দুই অবলম্বন ও আশ্রয়ের জায়গা। রাজেন ইতিহাসের ক্রমিক সূত্রবাহক। পরপর তথ্য মিলিয়ে ভুলচুক, হঠকারিতা আর অন্ধবিশ্বাসের ফলাফল হিসেব-নিকেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে, ধরিয়ে দিচ্ছে সব্যসাচীকে। ডিওয়াইএফআই সম্পাদক যখন হাওড়ার শিষমহলে রাজ্যসম্মেলনে বক্তৃতা রাখছেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। চাকরি সংস্থানের লক্ষ্যে। সেই সৎ দাবিগুলির পতন ঘটছে ক্ষমতা বদলের পরপরই। পুঁজিবাদের হাত ধরে, আন্দোলনের বিরুদ্ধে, বন্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের সরকারকে। সমসাময়িকতা থেকে বিচ্ছিন্ন সব্যসাচীকে এইসব অন্ধকার ও অন্ধ স্কুলে বেজে ওঠা ঘন্টার ধ্বনি শোনানোর জন্যই এমন 'ব্ল্যাকআউট' জোনের সৃষ্টি করেছিলেন নাটককার। ২০২৬ এ দাঁড়িয়ে আমরা সেই সব আদর্শচ্যুতিরই পুনরাবৃত্তি দেখে চলেছি প্রতিটি শাসকশ্রেণীর স্বভাব দিয়ে। চাকরিহীন, শিক্ষিত বেকার যুবতী-যুবকের দল ফ্যাতাড়ুর মতো হয়ে উঠতে পারছে না। জীবিকার দিশা পেতে কুটিরশিল্প নির্মাণের নামে খাওয়ারের ঠেলাগাড়ি সামলায়, নয়তো রুচিহীন রিলে ফলোয়ার বাড়িয়ে উপার্জনের পথ করছে প্রশস্থ।

এই সময়ের বুকে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তা হল 'অরাজনৈতিক'। রাজনীতির থাবা সময়কে এতটাই ভয় দেখিয়েছে যে মানুষ কোনো পক্ষ নিতে পারছে না। নাটকে সব্যসাচীকে ক্রমাগত যেন অতীতমুখী বর্তমান বলে চলেছে 'পক্ষ নিন সব্যসাচী, পক্ষ নিন'। কোনো একটা পক্ষ না নিলে সমাজে টিকে থাকা যাবে না। এই পক্ষহীনতার কনফিউশন ধীরে ধীরে আজ হয়ে উঠেছে একপ্রকার সুবিধাবাদী রাজনীতি। সে কথা সব্যসাচীরা জানতে পারেনি, জানিয়ে দিয়েছে এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে সমস্ত রকম কঠিন পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকে। মৃত্যু উপত্যকাময় এই দেশে হাজার টুনিবাল্বের উদযাপনে বিভোর বুদ্ধিজীবীসমাজ সেই অতীত থেকে সুবিধাবাদী রাজনীতিতে মকশো করতে করতে বর্তমানে হয়ে উঠেছে আরো বেশি প্রখর। অন্যায়ের সময় মুখ ঢেকেছে এবং তারপর সেই অন্যায়কারীর আমন্ত্রণে মঞ্চ আলো করে বসেছে। নাটকের ভিতর ২৫ বছর আগের সব্যসাচী যখন বিড়বিড় করে বলে চলেছে 'উই আর স্টাভট ম্যান উই আর হলোম্যান', তখন একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে নাটকের ইন্দ্রাণীর মতোই বর্তমান যুবসমাজ বোকা সেজে, হালফ্যাশন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সেজে, চারপাশ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে সময়। বুদ্ধিজীবীরা থাকছে সুবিধাবাদী নিরপেক্ষ-

> "One day/ the apolitical intellectuals/ of my country will be interrogated/ by the simplest of our people. /They will be asked what they did/ when their nation died out slowly."[৭]

অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের আজ সত্যিই সাধারণ মানুষ এসে প্রশ্ন করে চলেছে, মাটি মানুষ দেশের দুরবস্থায় আপনাদের অ্যাবসার্ডিজম, শূন্যবাদ নিয়ে যুক্তি-তর্ক সংস্কৃতি বোধ ঠিক কোন কাজে লাগছে? এর উত্তর কিন্তু লেখক ব্রাত্য বলিয়ে নিচ্ছেন নাটকের মুখ্য চরিত্র সব্যসাচীর মুখ দিয়েই। সব্যসাচী বলছেন, এলিয়েনেশন সাধারণ মানুষেরও হয়। এ শুধু খেটে খাওয়া মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পত্তি নয়। না পেতে পেতে, বিশ্বাসের চ্যুতি দেখতে দেখতে, চোখের সামনে আদর্শের ধরাচূড়া খসে পড়া সিস্টেমের সঙ্গে যুঝতে না পেরে, ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতাবোধ গ্রাস করে চলে সাধারণ মানুষকেও। আর সেই বীজ থেকেই জন্ম হয় ইন্দ্রদের, যাদের সিনড্রোম 'কনফিউশন'। কিছু বুঝতে না পারার ধাঁধা। এই সিন্ড্রোমে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ২১ শতকের দ্বিতীয় দশক। এলিয়েনেশনে বিপর্যস্ত, বিপন্ন এই জেনারেশন। এর প্রতিমুহূর্তে পরিচয় পাওয়া যায় স্কুল কলেজের ক্লাসরুমে। ডিগ্রি নিতে আসা শয়ে শয়ে ছাত্রছাত্রীর চাহনির জগতে প্রবেশ করতে পারে না অধ্যাপকেরা। এই জেনারেশন জানে না আদৌ তার কোনো নিজস্ব জগৎ নির্মাণ হয়েছে কিনা। প্রতিটি চাহনি যেন বিপদসীমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। শিকড়হীন এক উদ্বাস্তু মনোযোগে সংক্রামিত ছাত্রসমাজ। সিলেবাসের যে কোনো মডিউলের যত তীব্র ব্যবচ্ছেদই হোক না কেন তাদের কাছে সেইসব তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক, অনিচ্ছার জন্ম দেয়। এমনকী এই হলোম্যানিজম আজ এতটাই ভয়াবহ যে এই সময়ের শিক্ষার্থীর ৮০ শতাংশ একথাও বুঝতে পারে না যে তারা আদৌ কিছু বুঝতে পারছে কিনা। এই প্রসঙ্গ থেকে ইন্দ্রের কাছে আবার ফিরে আসা যাক। সে তার বাবাকে জানাচ্ছে বাবা'র না চিনতে পারার সময় সম্পর্কে। এই সময় আসলে তথ্যের তোতাপাখি। পৃথিবীতে এখন নামহীন, পরিচয়হীন, প্রান্তিক মানুষের হ্যাভনট শ্রেণি নিয়ে কেউ ভাবে না। এই সমাজে এখন দুইধরনের মানুষের বসবাস। ইনফরমেশন হ্যাভস আর ইনফরমেশন হ্যাভনটস।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, পালাবদল বা দ্বিচারিতা ধরতে পারছেন না সব্যসাচী, এমন নয়। আর কী কী ধরতে পারছেন না সব্যসাচী? এই ২৬ বছরের সময়প্রবাহে এসে পড়েছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিফোন, স্যাটেলাইটের যোগাযোগ এবং বিশ্বায়নের বিপুল পণ্যের সম্ভার। পৃথিবী নামক ছোট্ট একটি গ্রামে হাট বসেছে শুক্রবারে। প্যাকেজিংয়ের চোখ ধাঁধানো মোড়কে বিভোর হয়ে থাকছে সমাজ। ভুলে যাচ্ছে খোঁজ নিতে যা আছে

তা টাটকা না বাসি? যা আছে, তা কি আদৌ নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়? এই সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নের থাবায় বেড়ে চলেছে শপিংমল, ফাটকাবাজি, বিজ্ঞাপন, প্রতারণা আর বিলুপ্ত হয়ে চলেছে শংকর মুদিদের দোকানপাট। এই ব্যবস্থার শুরু নয়ের দশক থেকেই-

> "বদ্রিলারের মতে, মার্ক্সীয় 'মোড অফ প্রোডাকশন'-এর ব্যাখ্যা এখানেই কনজিউমার সংস্কৃতিকে বোঝার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। কনজিউমারিজম আসলে কতকগুলো 'চিহ্ন'র চেইন সিস্টেম যা প্রত্যেক মুহূর্তে জনসমাজকে বিশ্লিষ্ট করেছে।... পণ্যের মোড়ক নির্ধারণ করে দিচ্ছে তার বাজার দর, পণ্যের অন্তর্বস্তু এখানে নিরর্থক।... 'হাইপাররিয়াল'-এর ব্যাখ্যায়, যেখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিজ্ঞাপনে হয়ে ওঠে একমাত্র 'সত্য'। বাস্তবের অপমৃত্যু ঘটে। এরই হাত ধরে উচ্চ এলিট সংস্কৃতি আর নিম্ন লোকসংস্কৃতির ভেদরেখা ক্রমাগত ঘুচে যেতে থাকে।"[৮]

২৫ বছর আগে লেখা এই নাটক কি শুধুই প্রশ্ন করতে শেখায়? একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক কি ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠভাবে হলোম্যানেই পরিণত হবে, এবং এই 'নেইবাদ'কেই সময়ের দাবি বলে গ্রহণ করে নেবে? যেখানে বিবেক ও অন্ধকারকে সমার্থক শব্দ বলে মনে হয় না? এই উত্তেজনা, অস্থিরতা ও নিরাশার ভিতর আমাদের ফেলে রেখে যেতে চাননি নাটককার। তাই, ইন্দ্র এসে সান্ত্বনা দিতে চায় সব্যসাচীকে। সব্যসাচী গেয়ে ওঠে শিকল ভাঙার গান। ইউটিউবে নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হলো, ইন্দ্রও যেন সব্যসাচীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফেলছে, হয়তো ভুল করেই। হয়তো অবচেতনে এখনও সুস্থ পৃথিবীর, নিশ্চয়তায় ভরা প্রজন্মের স্বপ্ন দ্যাখে ইন্দ্ররা। এই অবচেতন যখন কণ্ঠে রূপ পায়, তখন আদর্শবাদী সব্যসাচীরাই যেন বলে ওঠে-

> "আমারও হাতে দেখো বৃদ্ধ বলিরেখা কপালে উঠেছে ভ্রূকুঞ্চন
> অতল গভীরে মৃত্যু বাসা বাঁধে পদধ্বনি তার আসন্ন
> আমারই ধ্বংসে তোমার উত্থান ভূমিতে পা রাখো হে সন্তান।
> কপালে চুমো খাব আবার জন্মাব তোমারই মাঝে আমি ভবিষ্যত"[৯]

অতএব সময়ের দাবি মেনে প্রখর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বয়ান রূপে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর মতো নাটক আরো বহুবার লিখে যেতে হবে। লিখতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। লিখতে হবে বর্তমান সমাজে সময়ের বদল, অবক্ষয়, ক্ষত এবং ক্ষতিগুলিকে চিনে নেওয়ার জন্য। এই দায়িত্ব প্রতিজনের উপর বর্তায়। তবে বলাই বাহুল্য, প্রতিজন এমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী শক্তিসম্পন্ন দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা নন। তথাকথিত অরাজনৈতিক এই প্রজন্মকে সমসাময়িক সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক রাজনীতির তুখোর দাবার চালগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একাধিক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'এর মতো নাটকের। আমরা তাই তাকিয়ে থাকি এই নাটকের স্রষ্টা ব্রাত্য বসুর দিকে। তিনি কী বলছেন?-

"প্রশ্ন; আর একটা 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'এর কথা ভাবেন?
উত্তর- আমি তো উইঙ্কল টুইঙ্কল সিরিজ লিখব ভাবছি! আমার ইচ্ছা আছে।"[১০]

তথ্যসূত্র:

১। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ উন্মাদের পাঠক্রম, সৎকার গাথা। পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১১৭।
২। বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র, উইঙ্কল টুইঙ্কল। ২০১৭, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৫৬।
৩। তদেব, পৃ.২৮০।
৪। তদেব, পৃ. ২৪৯।

৫। তদেব, পৃ. ২৫০।

৬। তদেব, পৃ. ২৭৭।

৭। Castillo, Otto Rene. Marxism and Art. Literature Marxist Internet Archive.

৮। সাহা, অর্ণব। ব্রাত্য-অবিকল্প নাট্যপুরুষ, সংকলন ও সম্পাদনা অর্ণব সাহা, রিক্ত, অষ্টাবক্র সময়ের রাজনীতি। উদার আকাশ প্রকাশনী, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৮।

৯। বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র, মৃত্যু ঈশ্বর যৌনতা। আনন্দ প্রকাশনা, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৩০০।

১০। মুখার্জি, প্রদীপ্ত। ব্রাত্য-অবিকল্প নাট্যপুরুষ। সংকলন ও সম্পাদনা অর্ণব সাহা, নানারূপে ব্রাত্য, উদার আকাশ প্রকাশনী, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮।